মুসলিম উম্মাহর একজন দরদী মানুষ ডআব্দুল্লাহ . কে যেমন দেখেছি– .জাহাঙ্গীর রাহ

- জাকারিয়া বিন আব্দুল ওয়াহহাব

[ভাই জাকারিয়া বিন আবদুল ওয়াহহাবের এই প্রবন্ধটি আমি পড়েছি। যদিও ডএর -.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ . সাথে আমারএকাধিকবার মুলাকাত হয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে এত বিস্তারিত আমার জানা ছিল না। তার আখলাক-চরিত্র, কর্ম ও কীর্তি এবং বিভিন্ন দ্বীনী খেদমতের কথা জেনে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন।

এক মজলিসে আমি সরাসরি তার কাছ থেকে শুনেছি যে, আমাদেরকে চলতে হবে সুন্নাহ ও উম্মাহকে সঙ্গে নিয়ে। অর্থাৎ শরীয়তের দলীল তো হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। এবং এই সুন্নাহ্ই উম্মতের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা ও সর্বোত্তম আদর্শ। তবে যেহেতু অনেক মাসআলার ক্ষেত্রেই সুন্নাহ্র বিভিন্নতা রয়েছে আবার বহু মাসআলার মধ্যে সুন্নাহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে বা তার আমলী রূপরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদীস ও সুন্নাহবিশেষজ্ঞ - ফকীহদের মাঝে ইজতিহাদী ইখতিলাফ রয়েছে, এজন্য নিয়ম এটা হওয়া উচিত, যে এলাকায় উম্মাহর মধ্যে যে আমল চালু আছে যদি সুন্নাহয় তার কোনো নির্ভরযোগ্য দলীল বিদ্যমান থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের সামনে ঐ সুন্নাহর মোকাবেলায় আরেক সুন্নাহর দাওয়াত দিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। তার এই কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। সত্য বলতে কীসব যুগের মুহাক্কিক ও - মুতাদিল উলামায়ে কেরামের নীতি এটাই ছিল। আমার বিশ্বাস, যদি তার উল্লেখ করা এই নীতি অনুযায়ী তিনি তার পুরানো কিতাব 'ইহইয়াউস সুনান'- এর নযরে ছানি করার সুযোগ পেতেন তাহলে অনেক মাসআলার মধ্যে তার রায় পরিবর্তন হয়ে যেত। অন্তত এই প্রবন্ধ পাঠ করে আমার এটাই মনে হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখি, অনেক ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তার অমুক কিতাবটি কেমন? আমি কি এ কিতাবটি পড়তে পারি? এধরনের প্রশ্ন আমার জন্য খুবই বিব্রতকর। কোনো কিতাবের উপর মতামত দিতে হলে সে কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়। যদি কেউ এর সুযোগ না পায় তাহলে সে কীভাবে জবাব দেবে? তাছাড়া কে কোন কিতাব পড়বে তা বলার জন্যে তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা জানতে হয়। এ জন্য সঠিক পন্থা এটাই যে, সকলেই আমরা নিজ নিজ দ্বীনী ও ইলমী মুশীরের সাথে মাশওয়ারা করেই মুতালাআর কিতাব নির্বাচন করব। যাই হোক, এই প্রবন্ধের জন্য আমরা মাওলানা যাকারিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ। নযরে ছানীর সময় যেখানে খুব প্রয়োজন অনুভব হয়েছে, সেখানে টীকায় কিছু নোট লিখে দেওয়া হয়েছে। আশা করি, সম্মানিত পাঠক টীকাগুলোর দিকেও নযর বুলাবেন।

রবিউল আউয়াল ১৪৩৫ হি .ড . আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 'আলফিকহুল আকবার'- এর বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তার বড় একটা অংশ আমি মুতালাআ করেছিলাম। এবং সে বিষয়ে আমার মতামত তাকে জানিয়েছিলামও। সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থে মাশাআল্লাহ কিছু উপকারী আলোচনা রয়েছে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে আপত্তিও রয়েছে। প্রথম কথা তো এই যে, যে 'আল ফিকহুল আকবারএর অনুবাদ তিনি করেছেন তা - নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ রায় মোতাবেক আবু হানীফা রাহ .এর কিতাব নয়। যদিও মোল্লা আলী কারী রাহ-.

সেটাকে আবু হানীফা রাহএর কিতাব মনে করে তার শরাহ্ও লিখে দিয়েছেন। এবং ইবনু আবীল-. ইয রাহ. 'শরহুল আকিদাতিত তাহাবিয়ায়' তাকে আবু হানীফা রাহএর কিতাব বলে উল্লেখ করে তার থেকে হাওয়ালা -. উদ্ধৃত করেছেন। মনে হয়, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাদের অনুসরণ করেছেন। আসল 'আল ফিকহুল আকবার' সেটিই যেটি মিসরের প্রকাশকগণ 'আল ফিকহুল আবসাত' নামে ছাপিয়েছেন। এবং অনেক প্রকাশক এটিকে 'আল ফিকহুল আকবার' নামেই ছাপিয়েছেন। সে ব্যাপারে অন্য কোনো প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় কথা হল, জাহাঙ্গীর সাহেবের বাংলা ব্যাখ্যায় মাতুরিদী ও আশ'আরীদের উপর ঢালাওভাবে কিছুটা কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে, যা মুনাসিব হয়নি। যদি তার পূর্ববর্তী মাতুরিদী ও আশ'আরীদের কিতাবগুলো গভীরভাবে মুতালাআর সুযোগ হত তাহলে সম্ভবত এমন সমালোচনা করতেন না। অপর দিকে তিনি কট্টরপন্থী সালাফীদের ব্যাপারে (এমনকি এই যুগের এই এলাকার সালাফীদের ব্যাপারেও) কোনো বিশেষ সমালোচনা করেননি। এটাকে একটি ত্রুটিই বলতে হবে, যা সম্ভবত পর্যাপ্ত মুতালাআ ও মুযাকারার সুযোগ না হওয়ার কারণে ঘটেছে।

সিফাতে মুতাশাবিহাতের মধ্যে তিনি লম্বা আলোচনা করেছেন কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্র আসল মাসলাক তার আলোচনা থেকে ফুটে উঠেনি। মোদ্দাকথা, এই কিতাবে নযরে ছানীর দরকার ছিল।

যাইহোক, কথা লম্বা হয়ে গেল। আমি বলতে চাচ্ছি, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের জীবনীতে আমাদের জন্য অনুসরণীয় অনেক দিক আছে। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহসালাফী আলেম হিসেবে . পরিচিত ছিলেন। আমরা আশা করব, আমাদের দেশের সালাফী আলিমগণ অন্তত ফুরুয়ী ইখতিলাফের ক্ষেত্রে তার কর্মপন্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তাআলা এই মুখলিস খাদেমে দ্বীন এবং অনেকাংশে মুতাদিল মেযাজ আলিম ও দায়ীকে, তার নেক খেদমতকে কবুল করুন এবং স্থায়ী করুন। আমীন। - বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক]

আমি দাওরায়ে হাদীস পড়ার পর 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'তে চার বছর উলূমুল হাদীস এবং ফিকহ বিভাগে পড়াশুনা করি। তারপর মারকাযের আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শে ৮ শাওয়াল ১৪২৫ হিজরীতে লক্ষ্মীপুরের 'আশরাফুল মাদারিস' বটতলীতে শিক্ষক হিসেবে খেদমত শুরু করি এবং আট বছর হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ের দরস শাওয়াল ১২ তাদরীসের খেদমতে নিয়োজিত থাকি।- ১৪৩৩ হিজরীতে ঈ ২০১২-০৮-৩০).) উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব .দা) বা-(. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত .এর পরামর্শে ড জামিআতুস সুন্নাহ, ঝিনাইদহএর উলূমুল - হাদীস বিভাগের 'মুশরিফ' হিসেবে আসি।

আমি হিফজ সম্পন্ন করার পর ঢাকার কামরাঙ্গীরচরে অবস্থিত 'মাদরাসাতুল মদীনাহ'- এ কিতাব বিভাগের শুরু থেকে 'জালালাইন' জামাত (১ম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষপর্যন্ত পড়ি। এরপর মুহাম্মাদপুর (সাত মসজিদের পশ্চিমে অবস্থিত জামিআ রহমানিয়া আরাবিয়া থেকে মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করি।

আমি শৈশব থেকেই কওমী মাদরাসার পরিবেশে বেড়ে ওঠা একজন মানুষ আর মরহুম ছিলেন আলিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়–য়া একজন ডক্টর এবং শিক্ষকতাও করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমাজে তার সম্পর্কে বহু কথা প্রচলিত। তাই আমার ঝিনাইদহ আসার বিষয়টি পরিচিত মহলের নিকট জানাজানি হলে তাদের

অনেকে আমার কাছে তাঁর সম্পর্কে নানা নেতিবাচক মন্তব্য ও অভিমত প্রকাশ করে এখানে আসতে বারণ করেন। তখন আমি সকলকে যে কথাটা বলেছিলাম তা হলো- "উস্তাযে মুহতারাম পাঠাচ্ছেন"। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেশুনেই আমাকে সেখানে পাঠাচ্ছেন।-

এখানে আসার পর দীর্ঘ চার বছর মরহুমকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় এবং এমন অনেক বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা আসলে দূর থেকে বোঝা সম্ভব ছিলো না। তাঁর জীবন থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক বিষয় যেমন দেখেছি তেমনি বিগত চার বছরে তাঁর জীবনে চিন্তা ও কর্মের অনেক বিষয়ে পরিবর্তনও দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম থেকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ছিলেন। ভিন্নতার মৌলিক কারণও ছিলো। তবে তার ব্যাপারে প্রচলিত অনেক কথাই সঠিক নয়; যা কিছুটা হলেও পাঠক সামনের আলোচনা থেকে অনুভব করবেন। কোনো মুনসিফ ব্যক্তি যদি তাঁর জীবনী লেখেন তাহলে তাঁর সকল বিষয়ে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করতে পারবেন। পত্রিকার প্রবন্ধে তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মবহুল জীবনের সবকিছু লেখা সম্ভব নয়। তাই তাঁর জীবনের যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য আদর্শ অনুসরণীয় হতে পারে এমন কিছু বিষয় এ প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

দ্বীন প্রচারে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ

তিনি সর্বদা মানুষকে দ্বীনমুখী করার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। মানুষের দ্বীনী উন্নতির ফিকির করতেন। এজন্য তিনি এলাকার মুসলামানদের দ্বীনী শিক্ষাকে সহজ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দ্বীনশিক্ষা - কার্যক্রম চালু করেন। এক্ষেত্রে তিনি ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই পৃথকভাবে পর্দার সাথে কুরআন- হিফ্য করা ও অন্যান্য দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের দ্বীনী জ্ঞান লাভ সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাভাষায় ধর্মীয় বইপুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে একটি ফিকির ছিলো - সমাজের মানুষের পরিবর্তন দরকার, মহিলাদের পরিবর্তন দরকার। তাদেরকে খারাপ পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে ভালো কাজে সম্পৃক্ত করা দরকার। এজন্য এলাকাবাসীদের নিয়ে তাঁর মসজিদে নিয়মিত মাসিক মাহফিলের পাশাপাশি বার্ষিক মাহফিলের আয়োজন করতেন। এলাকার অন্যান্য মসজিদেও মাসিক মাহফিল আয়োজনের চেষ্টা করেছেন এবং তিনি নিজে বা তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে মাহফিলগুলোর মাধ্যমে মানুষের মাঝে দ্বীনী সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। বাংলাদেশে ধর্মান্তকরণ ফেতনা ও খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার প্রতিরোধে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। ওয়াজমাহফিল ও বিভিন্ন রচনার - মাধ্যমে তিনি তাদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করার প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়াও স্থানীয় আলেম ও ইমামগণকে নিয়ে ইলমী ইজতিমার আয়োজন করেন। দ্বীন প্রচারে তাঁর বহুমুখী পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ :

১উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ এবং উচ্চতর দাওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা .

ঝিনাইদহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কওমী ও আলিয়া ধারার ছাত্রদেরকে যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪৩৩ হিজরীতে 'উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মুসলিমঅমুসলিম - সকলের মাঝে দাওয়াতী কাজের যোগ্য লোক তৈরি করা, খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও

অপপ্রচার প্রতিরোধে যোগ্য দাঈ তৈরি করা এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে ১৪৩৪ হিজরীতে 'উচ্চতর দাওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেন।

২কিতাব বিভাগ ও নূরানী মক্তব প্রতিষ্ঠা .

আগে এখানে 'আল ফারুক একাডেমী' নামে আলিয়া মাদরাসার আদলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একটি প্রতিষ্ঠান ও একটি হিফ্য খানা চালু ছিলো। এই প্রতিষ্ঠানের শিশু ও কেজি শ্রেণিতে বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেনের জন্য রচিত অপেক্ষাকৃত ভালো বই পড়ানো হতো। ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠানটি দাখিল বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছিলো এবং আলিয়া ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের দ্বারা পাঠদান করানো হতো।

তিনি যখন দেখলেন,   আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ছেলেদের মধ্যে ইলমী যোগ্যতা তৈরি হচ্ছে না,   এছাড়াও আনুষঙ্গিক নানা কারণে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে তাকওয়া ও দ্বীনদারির অভাবও প্রকট। তখন - তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা,   ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দ্বীনের কাজে সহযোগী জনাব শামসুল আরেফিন সাহেবের পরামর্শে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কওমী মাদরাসা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। হিফজ বিভাগসহ সকল বিভাগে কওমী ধারার উলামায়ে কেরামকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি বলতেন, "আমার শ্বশুর তো বিষয়টি আরও আগে (.ফুরফুরার পীর মরহুম আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহহার সিদ্দিকী রাহ) বুঝতে পেরেছিলেন, তাই পাবনা জেলার পাকশীতে এবং ঢাকার মিরপুর দারুস সালামে আলিয়া মাদরাসা বাদ দিয়ে কওমী মাদরাসা চালু করেন। তবে আমার বুঝতে একটু দেরী হলো।" পরবর্তীতে ১৪৩৪ হিজরী শাওয়াল থেকে তিনি কিতাব বিভাগ চালু করেন। এছাড়াও

এলাকার শিশুদের দ্বীনের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্ডার গার্টেন বাদ দিয়ে জানুয়ারী ২০১৫ থেকে যোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে হাটহাজারী নূরানী বোর্ডের অধীনে চার বছর মেয়াদী আবাসিকঅনাবাসিক নূরানী মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। নূরানী মক্তবে- বর্তমানে প্রায় আড়াইশ ছাত্র ছাত্রী দ্বীনী শিক্ষা লাভ-করছে। এছাড়াও তিনি ঝিনাইদহ জেলার হরিশঙ্করপুর ইউনিয়নের ভোজঘাট গ্রামে ও চুয়াডাঙ্গা জেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের সুবদিয়া গ্রামে 'মারকাযুস সুন্নাহ' নামে দুটি নূরানী মক্তব পরিচালনা করতেন।

ঝিনাইদহ জেলায় তেমন কোনো কওমী মাদরাসা নেই। সহশিক্ষাযুক্ত কিছু আলিয়া মাদরাসা আছে। তবে বর্তমানে কয়েক বছর হলো ঝিনাইদহ শহরে কিছু মক্তব ও হিফ্যখানা গড়ে উঠেছে। তিনি এসকল মাদরাসার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন এবং সেখানকার কোনো অনুষ্ঠানে ডাকলে শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের ডাকে সাড়া দিতেন। এ সকল মাদরাসার অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের মাঝে খুব জোরালোভাবে প্রচলিত শিক্ষার বিপরীতে ইসলামী শিক্ষার্জনের অপরিহার্যতার বিষয়ে যৌক্তিক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করতেন।

৩বালিকা হিফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগ প্রতিষ্ঠা .

ঝিনাইদহ এলাকায় ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং তাকওয়া, আখলাক, আদব ও সমাজ সচেতন নারী তৈরি করার লক্ষ্যে ১৪৩৫ হিজরীতে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থাপনায় বালিকা হিফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪পুস্তক রচনা-লেখনী ও ধর্মীয় বই .

তিনি ছোটবড় ত্রিশের অধিক অনুবাদ-, ব্যাখ্যা ও গবেষণামূলক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ইহইয়াউস সুনান', 'রাহে বেলায়াত', 'খুতবাতুল ইসলাম' এবং সর্বশেষ অনবদ্য রচনা 'পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা :'; যেটি ছাপানোর কাজে ঢাকায় যাওয়ার পথেই তিনি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না) ইলাইহি রাজিউন(

তিনি তাঁর রচনাসমূহে যে কোনো বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক ও প্রাচীন গ্রন্থসমূহের ওপর নির্ভর করতেন। সালাফী দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত অনেক যুবকের মাঝে তাঁর বইপত্রগুলো বেশ সমাদৃত হচ্ছে। আমরা মনে করি, তাদের উচিত মরহুমের জীবনের শেষের দিকের গৃহীত চিন্তাধারা ও কর্মপন্থাকে গুরুত্ব দেওয়া।

৫মাসিক মাহফিল .

প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার আসসুন্নাহ জামে মসজিদে মাসিক- মাহফিলের আয়োজন করতেন। উক্ত মাহফিলে তিনি নিজেই মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত আলোচনা করতেন এবং এশার নামাযের পর মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। উক্ত মসজিদের নীচ তলায় মাহফিলের আয়োজন করা হতো আর দ্বিতীয় তলায় মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে বসে ওয়াজ শোনার ব্যবস্থা থাকত। মহিলাদের মাঝে দ্বীনী চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর নেয়া প্রথম পদক্ষেপ ছিলো পরিপূর্ণ পর্দার সাথে মহিলাদের ওয়াজ শোনার ব্যবস্থা করা। পর্দা রক্ষার্থে মহিলাদের আসাযাওয়ার রাস্তাও পৃথক ছিলো। তিনি সাধারণত মহিলাদেরকে - ওয়াক্তিয়া নামায মসজিদে না এসে ঘরে আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু বাজার, স্টেশন বা জনসমাগমপূর্ণ রাস্তার পার্শ্ববর্তী মসজিদসমূহে মহিলাদের পৃথকভাবে নামাযের ব্যবস্থা রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন, যেন মহিলাদের নামায কাযা না হয়ে যায়। তবে জুমার বয়ান শোনার উদ্দেশ্যে কেবল শুক্রবারে মহিলাদেরকে তাঁর মসজিদে আসার কথা বলতেন। যদিও উক্ত বিষয়ে) আলিমদের দলিলভিত্তিক ভিন্নমত রয়েছে।(

৬ইলমী ইজতিমা .

ঝিনাইদহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খালেছ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে এলাকার অনেক মসজিদে অশুদ্ধ তিলাওয়াত ও ধর্মীয় জ্ঞানশূন্যতা ব্যাপক। তাই তিনি ঝিনাইদহ জেলার সকল থানার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মুয়াযযিনদের নিয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানস্থ মসজিদে প্রায় মাসেই 'ইলমী ইজতিমা'- এর আয়োজন করতেন। এখানে নির্দিষ্ট দিন আসরের পর থেকে পরবর্তী দিন সকাল আটটা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও প্রশিক্ষণ, কুরআন মশক, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও ইমামগণের প্রশিক্ষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে মজলিসটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। উল্লেখ্য, প্রতি 'ইলমী ইজতিমা'য় একটি বই নির্ধারণ করে দেয়া হতো যে বইটি পাঠ করার পর পরবর্তী 'ইলমী ইজতিমা'য় সে বিষয়ক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াযযিনগণের ইলমী জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হতো। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কৃত করা হতো এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীগণকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হতো। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি নিজে পর্যাপ্ত সময় দেয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রতিষ্ঠানের যোগ্য উলামায়ে কেরামগণ দ্বারা বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা করতেন।

৭খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার . প্রতিরোধ

তিনি সর্বদা দেশ ও মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে ভাবতেন। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর যে দরদ আমি দেখেছি, সেটি তাঁর কাছের লোকদের কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। বর্তমানে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মুসলিমকে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ কুরআন সুন্নাহ্র বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ঈসায়ী মুসলিম বা ঈসায়ী তরীকার মুরিদ হওয়ার নামে ধর্মান্তরিত করছে। এ সকল অপপ্রচারের প্রতিরোধ ও বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি ছোটবড় - (ক) : একাধিক মৌলিক গ্রন্থ লিখেছেন 'ইযহারুল হক' (গুরুত্বপূর্ণ টীকাসহ অনূদিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত(খ) .('কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম'। তাতে খ্রিস্টধর্ম অনুসারীদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর আরোপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও খ্রিস্টধর্মের অসারতা তাদের ধর্মগ্রন্থের আলোকে প্রমাণ করেছেন। (গ) 'পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা :'। এটি বাইবেলের প্রকৃত ইতিহাস, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি মৌলিক গ্রন্থ। বইটিতে তিনি বাইবেলের অসারতা প্রমাণে ইহুদীখ্রিস্টান বা পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষক ও সমালোচকদের মতামত মূল-ইংরেজি উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা প্রতিরোধে একদল অভিজ্ঞ লোক তৈরির জন্য 'উচ্চতর দাওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান বিভাগ' চালু করেছেন। উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঝিনাইদহ ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের মিশনারী কার্যক্রম কবলিত এলাকাগুলোতে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল ও ব্যক্তিগত আলোচনায় মিশনারীদের অপতৎপরতা ও বিভ্রান্তির বিষয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করতেন। এ বিষয়ে যে কোনো কাজে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কেউ আহ্বান করলে নিজের কাজ মনে করে তাতে তিনি শরীক হওয়ার চেষ্টা করতেন। বিধর্মীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি ডা. জাকির নায়েককে পছন্দ করতেন এবং তার ঢালাও সমালোচনা পছন্দ করতেন না। পাশাপাশি তিনি এটাও বলতেন, ডাজাকির নায়েক যদি . তার দাওয়াতী কাজের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলেই ভালো হতো। ফিকহী বিষয়ে তার মতামত দেয়া উচিত হয়নি। পাশাপাশি একজন দাঈ হিসেবে সুন্নাতি পোশাক পরিধান করাটা তার জন্য শোভনীয়। আমরা তার ভুলকে ভুল বলব; ভালোটা ভাল বলব। অবশ্য সেবামূলক কাজটা ভাল তরীকায় হচ্ছে কি না), সালাফের আকীদা ও মানহাজের রেয়ায়েত করে হচ্ছে কি না সেটা ভেবে দেখার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।(

৮টিভিতে প্রোগ্রাম .

মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহবিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ইসলামী অনুষ্ঠানে . 'আলোচক' হিসেবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। জাতি ও সমাজগঠণমূলক অনুষ্ঠানের তুলনায় টিভি- চ্যানেলগুলো যেহেতু অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রচারপ্রসারে বেশি ব্যবহৃত- হয় তাই এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন, যেন ইসলামী অনুষ্ঠান দেখার নামে কেউ অশ্লীলতার কবলে পড়ে না যায়। এজন্য তিনি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ও মাহফিলে তাঁর রচিত ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়তে মানুষকে উৎসাহিত করলেও 'টিভি প্রোগ্রামগুলো' দেখতে কাউকে উৎসাহিত করতেন না। তাঁর সমাজগঠনমূলক অনুষ্ঠানগুলো পরিবারস্থ-লোকজনকে দেখানোর জন্য নিজের বাসায়ও কোনো টিভি ছিলো না। তিনি প্রায়ই বলতেন, যারা টিভিতে সারাক্ষণ নাচ গান দেখে তারা যেন এর ফাঁকে ভালো কিছু দেখে বা দেখতে চাইলে-দেখতে পারে সে জন্যই সেখানে যাওয়া, যদি এর মাধ্যমে কেউ সঠিক পথ লাভ করে!

৯দাওয়াতী কাজে আধুনিক প্রযুক্তির উত্তম ব্যবহার .

লেখালেখির সকল কাজ তিনি নিজেই করতেন। তিনি কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম সম্পর্কে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং নির্ভুলভাবে খুব দ্রুত লিখতে পারতেন। এজন্য তাঁর লেখালেখিতে অনেক বরকত হয়েছে। ইন্টারনেট, অনলাইনভিত্তিক টিভি চ্যানেল, ওয়েবসাইট, ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তিকে অনিবার্য) দ্বীনী দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করতেন (খারাবী থেকে যথাসাধ্য বেঁচে; যেন এসবের মাধ্যমে মানুষ হেদায়েত লাভ করতে পারে।

লেখনী, আলোচনা ও ওয়াজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

তিনি খুব সহজসরল ভাষায় আলোচনা ও ওয়াজ করতেন। আলোচনা ও লেখনীতে- অনেক কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ সরল বাংলায় সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। ইংরেজি বলা ও লেখায় যথেষ্ট পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও আলোচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে ইংরেজি শব্দ পরিহার করতেন যেন সাধারণের বুঝতে অসুবিধা না হয়। শির্ক, বিদআত, সুন্নাতের গুরুত্ব ও সুন্নাহ অনুসরণ, বান্দার হক্ব, আত্মীয়তার হক্ব, সমকালীন প্রসঙ্গ, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সহ অন্যান্য সমাজ ও জীবনঘনিষ্ঠ প্রয়োজনীয় বিষয় সহজ ও সাবলীলভাবে আলোচনা করতেন। সাধারণত আলোচনায় আকীদা ও ফিকহী জটিল বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে যুবকদেরকে সম্বোধন করে

আলোচনা করতেন। তাদের আবেগঅনুভূতি ও বিভ্রান্তির বিষয়গুলো তুলে ধরে- দরদমাখা ভাষায় সংশোধনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। এ কারণে যুবকদের বড় একটি শ্রেণি তাঁর ভক্ত ছিলো। তাঁর আলোচনার শেষে সাধারণত একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকতো। তিনি মানুষের লিখিত বিভিন্ন প্রশ্নের দলিলভিত্তিক উত্তর দিতেন। কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে উত্তর দিতেন না। টিভিতে বা মাহফিলের প্রশ্নোত্তর পর্বে তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর না দিয়ে স্থানীয় আলেমদের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিতেন। এছাড়াও তিনি তাঁর ওয়াজমাহফিল এবং- সেমিনারগুলোর আলোচনায় আধুনিক শিক্ষিত সালাফী ব্যক্তিবর্গকে প্রান্তিকতা পরিহার করে কুরআনসুন্নাহর আলোকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।-

সামাজিক কর্মকা-

কসেলাই প্রশিক্ষণ .

সাধারণত মাহফিলগুলোর মাধ্যমে সাময়িকভাবে মানুষের মাঝে দ্বীনী চেতনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাঁর একান্ত কামনা ছিলো মানুষের মাঝে বিশেষত মহিলাদের মধ্যে স্থায়ী দ্বীনী চেতনা সৃষ্টি করা। এজন্য প্রয়োজন ছিলো প্রাত্যহিক ব্যবস্থাপনার অধীনে দ্বীন শেখানো। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে-সাধারণ শিক্ষিত ও দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী চেতনা প্রসারে আমাদের উদাসীনতার সুযোগে দেশীবিদেশী এনজিওসমূহ বিভিন্নভাবে- তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানী চেতনা থেকে বিচ্যুত করছে। তাই মহিলাদের মধ্যে স্থায়ী দ্বীনী চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে দ্বীন শেখানোর ব্যবস্থা করেন। এ লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষিত ও দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী চেতনার প্রসারে ছয় মাস ব্যাপী কুরআন তিলাওয়াত সহীহ করা ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শেখানোর পাশাপাশি স্থানীয় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিকার মাধ্যমে- সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সেখানে প্রতিদিন দুই ঘন্টাব্যাপী ক্লাসের অর্ধেক সময় ধর্মীয় বিষয়াদির জন্য বরাদ্দ ছিলো। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে সনদপত্র দেয়ার ক্ষেত্রেও দ্বীনী ক্লাসে নিয়মিত অংশগ্রহণ শর্ত ছিলো। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কয়েকজনকে পুরস্কার স্বরূপ সেলাই মেশিন ও সেলাই উপকরণ প্রদান করা হয়।

খসহায়তা প্রকল্প-বিনামূল্যে চিকিৎসা .

আর্ত মানবতার সেবা ও মানুষদেরকে দ্বীনী পরিবেশের সাথে পরিচিত করার মাধ্যমে দ্বীনমুখী করার লক্ষ্যে প্রতি শুক্রবার মাদরাসায় স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক দ্বারা রোগী দেখার ব্যবস্থা করেন। সেখানে রোগীদেরকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও জরুরি ঔষধ প্রদান করা হয়।

গনওমুসলিমদের তত্ত্বাবধান .

তিনি নওমুসলিমদের প্রতি সবিশেষ খেয়াল রাখতেন এবং বেশ কয়েকজন নওমুসলিমকে তাঁর তত্ত্বাবধানে রেখে পড়াশোনা ও অন্যান্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

উত্তম আখলাক ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণচিন্তা

লম্বা ও সুন্দর চেহারার এই মানুষটি,   যাকে হাজারো মানুষের ভিড়ে চেনা যেত;   ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত সদালাপী ও বিনয়ী ছিলেন। আন্তরিকভাবে নিজেকে ছোট হিসেবে পেশ করতেন,   নিজের আলাদা একটা ভাব বা শান রাখতেন না,   সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। যারাই তাঁর সাথে কিছু সময় -কাঁটিয়েছে তারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। উত্তম চরিত্রের অধিকারী এই মানুষটি কথাবার্তা ও চালচলনে পরিপূর্ণ সুন্নাহ অনুসরণের চেষ্টা করতেন। সাক্ষাতে আগে সালাম দিতেন। তিনি সর্বদা ফরয নামায মসজিদে আদায় করতেন,   ঘরে বা অন্য কোথাও আদায় করতেন না। সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা, তাকওয়া ও পরহেযগারী,   পোশাকপরিচ্ছদ- ও চালচলনে সালাফে সালেহীনের অনুসরণ এবং পরিবারস্থ সকলকে পরিপূর্ণ দ্বীন অনুযায়ী পরিচালনা ও দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা আসলেই তাঁর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ডক্টরেট ডিগ্রিধারীদের মধ্যে বিরল।   তিনি ব্যক্তি নয় বরং কর্মের সমালোচনা করতেন। আমি কখনো তাঁকে তাঁর আপনজন বা চরম বিরোধীদেরও সমালোচনা করতে দেখিনি। বরং কখনো তাদের প্রসঙ্গ উঠলে বা তাদের বক্তব্যের জবাব দিতে হলে তাদের জন্য দুআ করে তারপর জবাব দিতে দেখতাম। মানুষের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়,   ওয়াজ মাহফিল বা টিভি প্রোগ্রামে সাধারণ ও জটিল বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর মুখে সর্বদা হাসি লেগেই থাকতো। হাসিটা যেন তার মুখেরই অংশ ছিলো। মৃত্যুর পরেও তাঁর মুখে এ হাসির ছাপ অটুট ছিল!

ছোটদেরকে তার যোগ্যতার যথাযথ প্রশংসা করে এগিয়ে   দেয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরহংকার ছিলেন। অনেক বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রতিষ্ঠানের   প্রধান হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পরামর্শের জন্য অনেক সময় আমার কক্ষে চলে আসতেন। যখন আসতে পারতেন না তখন ফোনে আমাকে খুব সম্মানের সাথে সম্বোধন করে বলতেন: ‘শায়েখ,   আমি দোতলায় আমার রুমে আছি।’ শুধু এতটুকুই বলতেন। বলতেন না যে আমার রুমে আসেন। আজ থেকে চার বছর আগে ‘মারকাযুদ দাওয়াহ’ থেকে প্রথম যখন ফোনে তাঁর সাথে আমার কথা হয় তখন তিনি মিরপুর ‘দারুস সালাম মাদরাসায়’ ছিলেন। আমাকে ফোনে বললেন,   “শায়েখআপনি যদি দারুস সালাম মাদরাসাতে ! আসেন তাহলে ‘আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করতে পারবো’।” (তিনি এভাবেও বলতে পারতেন, “আপনি এখানে আসলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন”) । তিনি আমার উস্তাযের সমপর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও আমার সাথে উস্তাযতুল্য ব্যবহার করতেন।

উল্লেখ্য,   তিনি আলেমগণ ও মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরামগণকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ‘উস্তায’ বা ‘মাওলানা’ বলে সম্বোধন করার চেয়ে ‘শায়েখ’ বলে সম্বোধন করাকে বেশি পছন্দ করতেন।

তাঁর মৃত্যুর পর আলিম ও সাধারণ সকল শ্রেণীপেশার মানুষকে তাঁর- উত্তম আখলাকের কথা স্মরণ করে অঝোরে কাঁদতে দেখেছি। এরূপ আখলাকী মানুষ বর্তমান সময়ে সত্যিই বিরল!

হুবহু সুন্নাহর অনুসরণ

তাঁর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো 'আকায়েদইবাদত ও আখলাকের-' ক্ষেত্রে হুবহু সুন্নাহর অনুসরণ। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি সর্বাগ্রে সুন্নাহকে সামনে নিয়ে আসতেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম রাথেকে কোনো আমল আছে কি না ., সেটা তালাশ করতেন এবং পাওয়া গেলে তিনি সেটাই পালন করার চেষ্টা করতেন। ইবাদত পালন এবং ইবাদতের পারিভাষিক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার ও তাবীরের ক্ষেত্রে তিনি হুবহু সুন্নাহ সমর্থিত শব্দগুলো ব্যবহার করা পছন্দ করতেন। যেমন 'নামাযরোযার-' পরিবর্তে 'সালাতসাওম-', 'শবে বরাত' শব্দের পরিবর্তে 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান', প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। যিক্র ও দুআর ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলোই ব্যবহার করতেন এবং অন্যদেরকে এই শব্দগুলো ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করতেন। এই বিষয়ে তার কিতাব রাহে বেলায়েত এবং যিকর ও ওযীফা কিতাব দুটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়।

যে কোনো পরিস্থিতিতে হক্বকে গ্রহণ করা

তাঁর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, যা আমি বিগত চার বছরে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি, কোনো ধরনের ইলমী গোঁড়ামী তাঁর মধ্যে ছিলো না। তিনি সবসময় হক বিষয়টি কবুল করে নিতেন, নিজের মত আঁকড়ে থাকতেন না। যখনই কোনো বিষয় তাঁর সামনে দলিলভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিষয়টি তিনি বুঝতে পেরেছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর পূর্বের মত থেকে ফিরে এসেছেন। আমি এখানে আসার পরে তিনি ফিকহী বিষয়ে 'সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান একটি হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনা :' ও 'সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর'- এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সময়ে সেগুলোর পা-ুলিপি আমাকে দেখার জন্য দেন। তখন আমি বইদ্বয়ের কয়েকটি বিষয়ে দলিলভিত্তিক আপত্তি করি, সেগুলোর কয়েকটি তিনি মেনে নিয়ে পরিবর্তন করেন। এছাড়াও মাহফিলগুলোর আলোচনাতেও বারবার বলতেন, আমার লিখিত বা বর্ণিত কোনো মাসআলা যদি প্রকৃত অর্থে ভুল হয় এবং কেউ সেটা দলিলভিত্তিক আমাকে ধরিয়ে দেয়, তাহলে আমি সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি এবং যে আমার ভুল শুধরে দিবে তার জন্য আমি দুআ করবো।

জীবনের শেষ সময়ে অনেকগুলো বিষয়ে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১প্রথমদিকে তাঁকে দেখেছিলাম ., কেউ যদি স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিতো তাহলে এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে জুমহুরের মত বলতেন, এরপর বিপরীত মতটা 'নস'সহ বলে দিতেন। কিন্তু শেষ সময় দেখেছি তিনি শুধু জুমহুরের মতটাই বলতেন, বিপরীত মতটা বলতেন না।

২ মেয়েদের .চেহারা ঢাকার বিষয়ে প্রথম দিকে তাঁকে ফকীহগণের উভয় পক্ষের মত বলতে দেখেছি কিন্তু পরবর্তীতে তিনি 'মেয়েরা চেহারা ঢেকে রাখবে' শুধু এই মতটাই জোরালোভাবে উল্লেখ করতেন।

৩মসজিদে ফরয নামায পড়ে সাথে সাথে বাসায় চলে যেতেন এবং সেখানে . সুন্নাত পড়তেন। শেষ সময়ে দেখেছিলাম তিনি মাঝেমধ্যে মসজিদেও সুন্নাত পড়তেন।

৪শেষ দিকে তাঁকে দেখেছি ওয়াজ মাহফিলে বা সাধারণ মানুষদের মজলিসে যদি কেউ . 'উলামায়ে কেরামের' সমালোচনা করতো তাহলে তিনি খুব কষ্ট পেতেন। তিনি বলতেন, 'উলামায়ে কেরামের' দোষক্রটি- খায়েরখাহির সাথে কেবল তাঁদের মজলিসেই বলা যেতে পারে। তাহলে তাঁদের সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষদের সামনে তাঁদের সমালোচনা করলে কিছু মানুষ খুশি হয়। কারণ এই লোকগুলো উলামায়ে কেরামের সমালোচনার অপেক্ষায় থাকে, তাঁদের সমালোচনা শুনতে পছন্দ করে। তাছাড়া সাধারণ মজলিসে এরূপ সমালোচনার কারণে আলেম ও জনগণের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। উলামায়ে কেরামের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নষ্ট হলে সাধারণ- মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়। সুতরাং যে কাজ সাধারণ মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, একজন আলেমের এমন কাজ করা উচিত নয়।

৫আমি এখানে আসার পর প্রথম প্রথম . 'মাসিক মাহফিলগুলোতে' তাঁকে বলতে শুনেছি, আপনারা নিয়মিত এখানে কয়েকবার আসলে এবং কিছু ধর্মীয় বইপুস্তক পড়লে আলেম হতে- পারবেন। আলেম হওয়ার জন্য মাদরাসায় পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য রাখতেন যে, দ্বীন সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু জানা বা কিছু ধর্মীয় বই পড়া আর আলেম হওয়া এক জিনিস নয়। ডাক্তার হতে হলে যেমন একজন ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়ালেখা করতে হয়, এরপর ইন্টার্নি করতে হয়। তেমনি আলেম হতে হলে তাকে অভিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন পড়ালেখা করতে হয় এবং অনেক বিষয় অভিজ্ঞ আলেমের নিকট থেকে হাতেকলমে শিখতে হয়।-

সময়ের মূল্যায়ন

তিনি সময়ানুবর্তিতার সাথে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কোনোভাবেই সময়ের অপচয় করতেন না। তাঁর ব্যক্তিগত সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিলো, যেখানে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল ও আরবী সাহিত্য বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থাদির পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ বাংলাইংরেজি বইও ছিলো। তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন-, যা তাঁর তথ্যবহুল লেখনী ও আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। এছাড়াও আমি উক্ত লাইব্রেরীর কিতাবপত্র ব্যবহারের সময়ও দেখেছি অনেক কিতাবের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি অনেক জায়গায় সংক্ষিপ্ত নোট লিখেছেন, যা তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপকতার পরিচয় বহন করে।

সচেতনতা

তিনি মাদরাসার নিজস্ব অনুষ্ঠানগুলো মাদরাসাতেই করতেন। তবে উলামায়ে কেরাম বা সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান করলে সেটা মসজিদে করতেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয়

ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করতেন। আমি এখানকার একাধিক জেলা প্রশাসককে পেয়েছি যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগমন করতেন এবং দীর্ঘসময় বসে থেকে তাঁর আলোচনা শুনতেন। কখনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিকে এখানকার কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে দেখিনি।

আত্মীয়তার হক আদায়

আত্মীয়দের হক আদায়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পদ ফারায়েয অনুযায়ী তাঁর বোনদের মাঝে ভাগ করে দেন এবং বোনেরা সেগুলো বুঝে নেয়। তাঁর তিনতলাবিশিষ্ট বা-ড়ির নীচতলায় তাঁর অসুস্থ মা ও প্রতিবন্ধী বোন থাকেন। তাদের চলাফেরা ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা করা হয় এবং সেখানে তাদের সেবাযতেœর জন্য আলাদা খাদেমার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর তিনি তৃতীয় তলায় তাঁর স্ত্রীসহ ছোট মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। একমাত্র ছেলে ও বিবাহিত বড় দুই মেয়ের জন্য দ্বিতীয় তলায় থাকার ব্যবস্থা করেন। স্ত্রীসন্তানদের জন্য আলাদা খাদেমা - রেখেছিলেন। বাড়ির বাইরের কাজের জন্য একজন লোক রাখা ছিলো। মাদরাসায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াআসার পথে তাদের সাথে দেখা করতেন। মাদরাসায়- থাকাকালীন দেখতাম তাঁর মা কখনো কোনো প্রয়োজনে ফোন করলে খুব গুরুত্ব দিতেন এবং সাথে সাথে সমাধানের জন্য অস্থির হয়ে যেতেন।

বহু ব্যস্ততার মাঝেও তিনি পরিবারকে যথেষ্ট সময় দিতেন। মাঝেমধ্যে তাদের নিয়ে বিনোদনের উদ্দেশ্যে বেড়াতে যেতেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, কক্সবাজার প্রভৃতি স্থানের মাহফিলগুলোতে যাওয়ার সময় কখনো কখনো পরিবারস্থ লোকজনকে সাথে নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করে দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাতেন।

সংসার জীবনে তিনি ফুরফুরার মরহুম পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহহার সিদ্দিকী রাহএর-. সেজ কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই সুবাদে ফুরফুরার দাওয়াতী কার্যক্রমে তাওহীদ ও সুন্নাহর প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

কওমী আলিমদের সাথে গভীর সম্পর্ক

জীবনের শেষ দশকে কওমী আলেমদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষত 'মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা'- তে তাঁর যাওয়াআসা এবং সেখানকার ইলমী - গবেষণা দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। 'মারকাযুদ দাওয়াহ্'র প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি প্রায়ই বলতেন, ''আমার ছাত্ররা বড় অফিসার হওয়ার চেয়ে অল্প আলোতে বসে কুরআনহাদীস নিয়ে গবেষ-ণা করবে, কিতাবপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করবে- আমি মনে করি দুনিয়া ও আখিরাতে এটাই আমার বড় পাওয়া।'' এ লক্ষ্যেই তিনি পর্যায়ক্রমে 'তাখাসসুস' ও 'কিতাব বিভাগ' চালু করেন। পরবর্তীতে তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় এক সফরে গেলে সেখানকার নূরানী শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং সে বছরই কিন্ডার গার্টেন বাদ দিয়ে নূরানী পদ্ধতিতে প্রাইমারী শিক্ষা চালু করেন।

এ সময়ে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, কওমী ধারার উলামায়ে কেরামের সাথে না থেকে সহীহভাবে দ্বীনের কাজ করাটা কঠিন। এজন্য তিনি তাহকীকী মেজাযসম্পন্ন ও সুন্নাহপ্রেমী কওমী উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এটাও তিনি অনুভব করেন যে, প্রথম দিকে আলিয়া ধারার উলামায়ে কেরামকে নিয়ে কাজ করলেও তাতে বরকত হয়নি কওমী আলিমদেরকে তাঁর কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার পর যখন তিনি তাঁদের আস্থা অর্জন করলেন, তখন সেই অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা আসসুন্নাহ ট্রাস্টকে কবুল করে নিয়েছেন।-

কওমী, আলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে সমন্বয়

তিনি সকল ধারার উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকজনকে নিয়ে চলতেন। কওমী, আলিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকছাত্র ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্-যে সমন্বয়ের চেষ্টা করতেন। এ লক্ষ্যেই তিনি 'আততাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস' ও 'আততাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে সুন্দর ব্যবস্থাপনায় কওমী, আলিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা পড়াশুনা করছে। আমাদের দেশে যারা আলিয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক পড়াশোনা বা শিক্ষকতা- করেন, সাধারণত তারা নিজেদেরকে দ্বীনের খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত না করে চাকরিকেই তাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ফেলেন। আবার অনেকে তাদের দ্বারা দ্বীনের খেদমত করা সম্ভব বলেও মনে করেন না। কিন্তু আলিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও শিক্ষকতা করার পাশাপাশি দ্বীনের বহুমুখী খেদমত করাও যে সম্ভব, মরহুম তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মবহুল জীবন দ্বারা সেটি প্রমাণ করে গেছেন।

আলিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান ও অনৈসলামিক পরিবেশের যৌক্তিক সমালোচনা

তিনি আলিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। এতদসত্ত্বেও এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও লেখাপড়ার মানের যৌক্তিক সমালোচনা করতেন। সেখানে গিয়ে কওমী মাদরাসা ও আলিয়া মাদরাসার দ্বীনদার ছেলেদের কেবল চাকরিমুখী চেতনা, আখলাক ও সীরাত- তথা দাড়ি) সুরতের পরিবর্তন, টুপি, ইসলামী লেবাস ছেড়ে অনৈসলামিক পরিবেশের শ্রোতে মিশে যাওয়ার বিষয়গুলোতাঁকে (চিন্তিত করতো। তাদেরকে এ সমস্ত খারাবী থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি তাদের মাঝে যে কোনো অবস্থায় দ্বীনী খেদমতমুখী চেতনা গড়ে তোলা ও ইলমী যোগ্যতাকে আরও পরিশীলিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে আমাদের সাথে তাঁর মনের অস্থিরতার কথা প্রকাশ করতেন এবং কীভাবে ও কোন্ উপায়ে তাদেরকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জামিআতুস সুন্নাহ' ঝিনাইদহে 'উলূমুল হাদীস বিভাগ' খোলার অন্যতম কারণও ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী, যোগ্যতাসম্পন্ন ও দ্বীনদার ছেলেদের ইলমী ও তাহকীকী মেযাজ তৈরি করা ও অনৈসলামিক শ্রোতে থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। এছাড়াও মাদরাসা থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মানের ছাত্রদের জন্য স্বল্পকালীন দ্বীনী বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন কোর্স খোলার কথা আমাদেরকে অনেক সময় বলতেন কিন্তু রিজাল ও ওসায়েলের অভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ফিকহী বিষয়ে তাঁর ভিন্নতার কারণ

তিনি বাংলাদেশে আলিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করেছেন। তারপর তিনি রিয়াদের 'জামিয়াতুল ইমাম' থেকে অনার্স, মাস্টার্স এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। সৌদি আরবে প্রায় আঠারো বছর যাবৎ তিনি হাম্বলী মাযহাব কেন্দ্রিক পড়াশোনা করেন। সৌদি সরকার হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধানত হাম্বলী ফিকহ পড়ানো হয়। এ কারণে তিনি অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় হাম্বলী মাযহাবের মাসআলাসমূহের দলিলাদি অধিক জানতেন। যেহেতু প্রায় দেড় যুগ তিনি আমাদের চেয়ে ভিন্ন একটি পরিবেশে ভিন্ন একটি মাযহাবের উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখদের সাথে কাটিয়েছেন এবং তাদের মাযহাবভিত্তিক পড়াশোনা করেছেন-, সেখানে আমাদের পরিবেশ ও ফিকহী বিষয়ের সাথে যেখানে) উলামায়ে কেরাম 'মুজতাহাদ ফীহ' মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের আলোকে কুরআনসুন্নাহর -তাঁর অনেক (অনুসরণ করেন ক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। যা আমরা তাঁর মত অন্যদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি সাধারণত সমাজে প্রচলিত দলিলভিত্তিক মাসআলাগুলোর বিপরীত আমল করতেন না। যেমন তিনি রফউল ইয়াদাইন করতেন না, বুকে হাত বাঁধতেন না, জোরে আমীন বলতেন না। যদিও কখনো কখনো মৌখিক আলোচনায় বিপরীত মতকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলতেন, "তারজীহাতের একটা দিক হলো, সমাজে কোনো ফিকহ প্রচলিত থাকলে সেটাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। এটাই সালাফে সালেহীনের মানহাজ। তবে এর ভিন্ন মতকে আমি নাজায়েয মনে করি না। আমি কোনো মাসআলায় হানাফী ফিকহ থেকে বের হই না। তবে যে কয়টি ক্ষেত্রে বের হয়েছি সেখানে এক বা একাধিক হানাফী বড় ফকীহের মত পাওয়া যাবে।"

হাম্বলী মাযহাব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে তিনি সাধারণত নির্দিষ্ট মাসআলায় দলিলভিত্তিক সবগুলো মত উল্লেখ করতেন, একটাকে আরেকটার উপর তারজীহ দিতেন না। বরং যে কোনো এক মতানুযায়ী আমল করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। তারজীহ দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা অন্য ইমামের মতকে খাটো করার কঠোর বিরোধী ছিলেন।

তিনি সাধারণত হানাফী মাযহাবের আলোকে ফাতওয়া দেয়ার চেষ্টা করতেন। তবে হানাফী মাযহাবের যে বিষয়গুলো তাঁর বিস্তারিত মুতালাআ ছিলো না, ব্যস্ততার সময়ে সে বিষয়ে তিনি কখনো কখনো আমাকে ফোন করে বলতেন, "শায়েখ, আমার তো হাম্বলী মাযহাব নিয়ে পড়াশোনা। এই মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের আলিমদের মতামত কী? আপনি বিষয়টি দেখে আমাকে একটু জানাবেন।"

মাযহাব, আহলে হাদীস ও ফুরুয়ী ইখতিলাফ সম্পর্কে তাঁর কর্মপন্থা

গত বছর তাঁর একটি আলোচনার ভিডিও, (তাঁর মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে ১লা রজব ১৪৩৭ হিজরীতে (তাখাসসুস বিভাগদ্বয়ের যৌথ দরসে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এবং বেশ কয়েকটি মাসিক মাহফিলের আলোচনাতে তিনি মাযহাব, আহলে হাদীস ও ফুরুয়ী ইখতিলাফকেন্দ্রিক মুসলমানদের পারস্পরিক

বাড়াবাড়ির বিষয়টি যেভাবে তুলে ধরেছিলেন তা তাঁর ভাষায় নিম্নরূপ : “আমরা যারা মাযহাবের বিরুদ্ধে কথা বলি তারাও বিষয়টি বুঝি না, আহলে হাদিসেরও তো একই ব্যাপারে দশটি মত আছে, আপনি কোনটা মানবেন? আপনাকে কোনো না কোনো আলেমকে প্রাধান্য দিতেই হবে। বর্তমান সময়ে আরবের প্রসিদ্ধ তিনজন আলেম হলেন- শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী রাহ., শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায রাহ., শায়েখ ছালেহ আলউছাইমিন রাহসা .রিয়াদের একজন মশহুর আলেম ড ।.‘দ আল বুরাইক রচিত ‘আল ইজায ফীমাখতালাফা ফীহিল আলবানী ওয়াল উসাইমিন ওয়াবনু বায মিনাল উসূলি ওয়াল ফুরু’। আলবানী, ইবনে বায এবং উছাইমিন এই তিন মহান পণ্ডিত আকীদা এবং ফিকহের যেসব বিষয়ে ইখতেলাফ করেছেন তার কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ বইতে রয়েছে। তাতেও প্রায় চারশ মত। বাংলাদেশের আহলে হাদীস আলেমদের ভেতরে ডআসাদুল্লাহ গালিব ., আমাদের আকরামুজ্জামান ভাই, শহিদুল্লাহ খান মাদানী, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ রয়েছেন । আমি (আল্লাহ তাদের সবাইকে হেফাযত করেন) তাদের সবাইকে মহব্বত করি, নাম ধরলাম শুধু বোঝানোর জন্য। তাদের ভিতরেও অনেক মাসআলায় মতভেদ আছে। ডগালিব ওয .ুেজ করেছেন এক কুরবানীতে ৭ ভাগ হবে না, আকরামুজ্জামান ভাই বই লিখেছেন অবশ্যই ৭ ভাগ হবে। আমাদের মুযাফফর বিন মুহসিন বই লিখেছেন, ১২ তাকবীরের সব হাদীস সহীহ, ৬ তাকবীরের সব হাদীস জাল। আকরামুজ্জামান ভাই বই লিখেছেন, ১২ তাকবীরের হাদীসও সহীহ, ৬ তাকবীরের হাদীসও সহীহ।

এখন প্রশ্ন হলো আপনি কী করবেন? যেটাই মানেন আরেকজনের বিরুদ্ধে আপনাকে যেতেই হবে। মতভেদ থাকবেই, কারণ কুরআন এবং হাদীস হলো খাঁটি স্বর্ণ। খাঁটি স্বর্ণ কি গলায় পরা যায়? স্বর্ণের বার কী হাতের চুড়ি হিসেবে পরা যায়? বার দিয়ে চুড়ি বানাতে গেলে কী করতে হয়? খাদ মেশাতে হয়, তদ্রূপ হাদীসকে জীবনের সাথে মেলাতে গেলে আলেমদের ইজতেহাদ করতে হয়। যেখানে হাদীস আছে সেখানেও করতে হয়, যেখানে নেই সেখানেও করতে হয়। যেমন মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবারে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন, আর আরাফার দিন রোযা রাখতে আদেশ করেছেন । এখন আরাফার দিন শুক্রবার হলে কী (জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন এটা মুস্তাহাব) করবেন? কোনো হাদীসে নেই- আরাফার দিন শুক্রবার হলে রোযা রাখবে। কোনো হাদীসে নেই- আরাফার দিন শুক্রবার হলে রোযা রাখবে না। এক্ষেত্রে দুটো হাদীসের সমন্বয়ের নাম হলো ইজতেহাদ।

আহলে হাদীসদের অনেক কাজ ভালো, তারা সহীহ হাদীস মানার চেষ্টা করেন, তারা বিদআত, শির্ক থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন।[1] তাদের আরেকটা কাজ ভয়ংকর খারাপ। তারা ছোট ছোট ফিকহী মাসআলা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে দ্বীন মনে করেন। রফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না, লা হাউলা ওলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহকোন্ হাদীসে আছে রফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না !?! আবার যারা মাযহাব মানে তাদেরকে কাফের বলা, এটা তাদের আরেকটি ভয়ংকর কথামাযহাব মানা ! যে জায়েয, এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা আছে। যে মাযহাব মানে না বলে দাবি করে, সেও তো কাউকে না কাউকে মানে। আবার আমরা যারা মাযহাব মানি, আস্তে আমীন বলি, কোথাও কোথাও তাদের দেখি- জোরে আমীন বললে বা রফউল ইয়াদাইন করলে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। কোথাও কোথাও দেখি ঘোষণাও দেয়া হয়, ‘হানাফী মসজিদে’ কেউ জোরে আমীন বলতে পারবে নাবড় অবাক লাগে !, মসজিদ শুধু হানাফীর না সব মুসলমানের?! যারা আল্লাহর দ্বীনকে ভাগ করে একটাকে হানাফী মসজিদ,

একটাকে শাফিয়ী মসজিদ, অপর কোনোটাকে আহলে হাদীস মসজিদ বানায়- নবীর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, রফউল ইয়াদাইন করলে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয় কিন্তু সুদখোরঘুষখোরদের- মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয় নাআবার যারা জোরে আমীন বলে ! তাদের আচরণও আপত্তিকরজোরে আমীন বলার জন্য সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে মসজিদ আলাদা করে ! ফেলবে?! মুসলমানদের ঐক্য রক্ষা ফরয, জোরে আমীন বলা ফরয না। বিশেষ করে যেখানে সবাই আস্তে আমীন বলে, দুই একজন জোরে বা উচ্চস্বরে আমীন বললে মুসল্লিদের নামাযে মনোযোগ নষ্ট হয়। যদি কেউ জোরে আমীন বলাকে উত্তম মনে করেন, তাহলে এমন জোরে বলবেন, যেন শুধু পাশের মুসল্লি শুনতে পায়। তাহলে সুন্নাত আদায় হয়ে গেল। আপনি যদি নফসের ইবাদত করেন আর ভাবেন- বিরাট কিছু হয়ে গেছিআমি মুসলমানদের শ !েখাবোতাহলে আমার কিছুই বলার নেই। !

(তিনি বলেনকুফর বিদআত-আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি মনে হয় শির্ক (, আল্লাহর হক্ব, বান্দার হক্ব, ফরয, ওয়াজিব, হালালহারাম ইত্যাদি। এরপর এখতেলাফ থাকবে। আমি এ ব্যাপারে শিথিলতা - কুফর-প্রদর্শন করি। এজন্য যারা শির্ক, বিদআত ও মাজার পূজায় লিপ্ত যেমন, শিয়াকাদিয়ানী-, আটরশি, চন্দ্রপাড়া, মাইজভাণ্ডারী এবং ঐসব রেজভীবেরলভী-- যারা আকীদা ও আমলের বিভিন্ন শিরকে লিপ্ত। এদের কারও সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার লেখালেখি ও আলোচনার মূল বিষয়ই হলো তাদের গোমরাহী থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে তাওহীদ ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে আনা। তবে যারা মৌলিকভাবে কুরআনঅরাজনৈতিক দলকে -সুন্নাহ মেনে চলে এরূপ সকল রাজনৈতিক- আমি পছন্দ করি; কিন্তু আমি কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত নই। বাংলাদেশের এরূপ দলগুলোর পারস্পরিক ঐক্য এবং মৌলিক বিষয়গুলোতে তারা একত্রে কাজ করুক এটা আমি কামনা করি এবং তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিরসনই আমার প্রত্যাশা। এজন্য তাদের কেউ ভালো কোনো কাজে আমাকে ডাকলে আমি তাদের ডাকে সাড়া দেই। আবার আমি আমার লেখায় ও আলোচনায় তাদের ভালো গুণগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের কোনো ভুল থাকলে সেটাও উল্লেখ করি।

(তিনি আরও বলেনআমাকে লোকজন (গায়রে মুকাল্লিদ বলে। গায়রে মুকাল্লিদ বলার কারণ হলো আমি সৌদি আরবে পড়েছি। আমার বইতে আহলে হাদীসদের নিন্দা করিনি। আবার অনেকে অনেক কিছু বানিয়েও বলে। আহলে হাদীসরাও আমাকে হানাফী বলে। কারণ তারা আশা করেছিলো আমি মাযহাবের বিরুদ্ধে কথা বলবো। অথচ আমি মাযহাবের বিরোধিতাকে জায়েয মনে করি না।

আবার কেউ বলে, আমি 'গোপন আহলে হাদীস', কেউ বলে, 'গোপন হানাফী'! এমন অনেক কথা আমাকে শুনতে হয়। আমি মৌলিকভাবে মাযহাব মানি। আরও স্পষ্টভাবে বললে আমি হানাফী মাযহাব অনুসরণের চেষ্টা করি। আমি মনে করি, ফিকহের ইজতিহাদের যোগ্যতা আমার নেই। তবে যদি কখনো কোনো মাসআলায় সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ এবং ইমামগণের মতামত দেখার পরে কারো 'কওল'কে আমি কুরআনসুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী মনে করি এবং আমার ইতমিনান হয়-, আমি তাঁর মত গ্রহণ করি। এর বিপরীত মতের পক্ষেও যদি সহীহ হাদীস থাকে তাহলে সে অনুযায়ী আমল করাকে কখনো খারাপ মনে করি না। বান্দা তার দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সরাসরি 'মুহাসাব'। কাজেই আমার ইতমিনান হলো বড় বিষয়।[2] এক্ষেত্রে মাযহাবের খেলাফ করাটাকে নাজায়েয মনে করি না। এতে আমার মাযহাব

নষ্ট হয়, তাও মনে করি না। আমি মাযহাবী বা গায়রে মুকাল্লিদ কি না, এটা বলতে পারবো না। তবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রাহযেভাবে মাযহাব মেনেছেন . আমি ঐ ধরনের মাযহাব মানি। এরকম মানাতে যদি মনে হয় আমি মাযহাবের অনুসারী তাহলে মাযহাবের অনুসারী।[3]

যদি হানাফী হওয়ার অর্থ হয় ভারতবর্ষের হানাফী আলেমদের সকল মত মেনে নিতে হবে। তাহলে এমন হানাফী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। হানাফী হওয়ার নামে কঠোরতা আমি পছন্দ করি না। আমি রফউল ইয়াদাইন করি না। তবে কেউ রফউল ইয়াদাইন করলে খারাপ লাগে না। শাফেয়ী বা হাম্বলী হিসেবে রফউল ইয়াদাইন করলে দোষ নেই আর আহলে হাদীস হিসেবে করলে দোষ!- এটা আমি মানতে পারি না। তবে সে যদি রফউল ইয়াদাইন করার পাশাপাশি বিপরীত মতকে মন্দ বলে তাহলে তার কথাটি মন্দ কিন্তু তার আমল তো মন্দ হয়নি।[4] কেউ যদি মুতাদিল আহলে হাদীস হন, আহলে হাদীসের মাসআলাগুলোকে তারজীহ দেন, সহীহ হাদীসের ওপর থাকেন, জুমহুরের মাসলাক অনুযায়ী আমল করেন, বিপরীত মতগুলোকে আপত্তিকরভাবে ইনকার না করেন, তাহলে আমার আপত্তি নেই। আমি এটাকে খারাপ মনে করি না। কিন্তু তিনি আহলে হাদীস নাম দিয়ে সমাজে প্রচলিত জায়েযমুবাহকে হারাম - বলবেন, দলিলভিত্তিক মতকে মন্দ বলবেন, মাযহাব মানাকে হারাম বলবেন, আর নিজে মাযহাব তৈরি করবেন, গালিগালাজ করবেন, সেটা আমি অপছন্দ করি। আমার কাছে এটা মুনকার। আল্লাহ তাআলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। যারা মাযহাবের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলে, আমি তাদের সাথে প্রোগ্রাম করি না। কখনো সরাসরি নিষেধ করি। আবার কখনো কৌশলে এড়িয়ে চলি। যখন কেউ আমাকে বলে মাযহাবের মাধ্যমে দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে, আমি বলি, না; বরং আহলে হাদীসের মাধ্যমে দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে যেটা প্রচলিত আছে এবং তার পক্ষে আমি দলিল পাচ্ছি, এটা নিয়ে ঝগড়া করার দরকার কী? সৌদি আলেমদেরকে এটা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখিনি। ফিকহী ব্যাপারে আমি মনে করি, এই তার্ফারুক ঠিক না (বিভেদ), এটা উম্মতের ক্ষতি করে।

আমাকে উদ্দেশ্য করে একজন বলেছে, "আপনি যদি আহলে হাদীস হন, তাহলে ভালো আহলে হাদীস, আপনি হানাফীদের মহব্বত করেন। আর যদি হানাফী হন, তাহলে ভালো হানাফী যে আহলে হাদীসদের মেনে নেন।"

একটা জিনিস বাস্তব যে আমি আহলে হাদীস ভাইদের মানহাজের কারণে তাদের সাথে মিশতে পারি না, যদি মিশতেই পারতাম তাহলে আমার এখানে তাদেরকে জড়ো করতে পারতাম। সৌদি আরব থেকে আসার সময় আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তুমি ডগালিবের সাথে কাজ করবে। . আমরা তোমাকে মা'হাদ করে দেব (ইন্সটিটিউট), পূর্ণ আর্থিক সহযোগিতা করব। তারা আমার পড়াশোনার মান ও বিভিন্ন দাওয়াতী কার্যক্রমের কারণে আমাকে পছন্দ করেছিল। আমি স্বভাবগতভাবেই তাদেরকে বলেছি, "আমি সেটা করব না। আহলে হাদীস ভাইদের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, তারা ভালো, তাদের আকীদা ভালো, চেতনা ভালো কিন্তু তাদের মানহাজ ভালো না।[5] তারা যে মানহাজে কাজ করে, আমি সেই মানহাজে উম্মতের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে পারবো না। আমি তাদেরকে এই কথাটাই বলেছিলাম; আমি তাদের সাথে কখনই কাজ করবো না।" আমি একাই কাজ করছি।

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই আলেমে দ্বীন ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর মায়ের নানাবাড়ি ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার অন্তর্গত দ্বিগনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঝিনাইদহ শহরের 'ভুটিয়ারগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। তারপর ঝিনাইদহ 'সিদ্দিকীয়া আলিয়া মাদরাসায়' ফাযিল পর্যন্ত অধ্যয়ন করে ১৯৭৯ সালে ঢাকা আলিয়া থেকে প্রথম শ্রেণিতে অষ্টম স্থান অধিকার করে হাদীস বিষয়ে কামিল পাশ করেন। মাদরাসায় অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি মাগুরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ থেকে এসসি.এস., এইচসি.এস. পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে যশোর বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডে যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছিলো, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় সম্মাননার অংশ হিসেবে তাদেরকে নিয়ে নৌ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে যশোর শিক্ষাবোর্ডের প্রথম স্থান অধিকারি হিসেবে মরহুম ড . আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরও ছিলেন।

কামিল পড়ার পর ঝিনাইদহ সদরের নাসনা 'নূরনগর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদরাসায়' প্রায় দুই বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সৌদি সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের রিয়াদস্থ 'জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল ইসলামী' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৮৬ সালে অনার্স, ১৯৯২ সালে মাস্টার্স ও ১৯৯৮ সালে নাহব এর ওপর -(আরবী ব্যাকরণ) পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, সেখানে তিনি চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৯৬নাম্বার পেয়ে প্রথম % স্থান অধিকার করেন এবং সেখানে অধ্যয়নকালে বর্তমান সৌদি বাদশা ও তৎকালীন রিয়াদের গভর্নর সালমান বিন আব্দুল আজীজের হাত থেকে পর পর দু'বার সেরা ছাত্রের পুরস্কার গ্রহণ করেন। সৌদি আরবে যে সকল শায়েখের কাছে তিনি হাদীস ও ফিকহ্ শিখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বায রাহ., শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আলজিবরীন-, মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ আলউছাইমীন রাহ., শায়েখ সালেহ ইবন ফাওযান প্রমুখ।

এছাড়াও তিনি আরবের হানাফী আলেমদের মধ্যে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহকে অত্যন্ত -. পছন্দ করতেন এবং তাঁর রচনাসমূহ প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করতেন। উপমহাদেশের আলেমগণের মধ্যে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দাও তাঁর মানহাজকে খুব পছন্দ করতেন এবং বিভিন্ন ইলমী .বা. বিষয়ে তাঁর বক্তব্যকে উদ্ধৃতি হিসেবে পেশ করতেন। তিনি ইবনে তাইমিয়া রাহ., ইবনুল কায়্যিম রাহ., শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহএর রচনাসমূহ-.ও আব্দুল হাই লখনবী রাহ . ও চিন্তাচেতনা - দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং তাখাসসুসের ছাত্রদের বিভিন্ন দরসে তাদের আলোচনা করতেন। তবে ফিকহ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহএর অনুসরণ করতেন।-.

রিয়াদে অধ্যয়নকালের শেষ সময়ে তিনি উত্তর রিয়াদ ইসলামি সেন্টারে দাঈ ও সৌদি আরবে বসবাসকারী মার্কিন সৈন্য ও ইংরেজি ভাষাভাষীদের মাঝে দাওয়াতী কাজে দোভাষী হিসেবে প্রায় তিন বছর কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে অনুবাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন। মাস্টার্সে পড়াকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কুরআনুল কারিমের ১৮ পারা মুখস্ত করা নির্ধারিত ছিল। তিনি উক্ত ১৮ পারা মুখস্ত করেন। তারপর বাকি পারাগুলো বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও এ্যাম্বেসীতে

যাওয়াআসার পথে গাড়িতে- বসেই প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে হিফজ সম্পন্ন করেন এবং দেশে এসে পুরোপুরি ইয়াদ করেন।

তিনি রিয়াদে থাকাকালীন নিজ পরিমলে- সুপরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি কুল্লিয়াতুল লোগার মুমতাজ ছিলেন। কোনো সৌদি 'কুল্লিয়াতুল লোগা আলআরাবিয়ায়' মুমতাজ হওয়া খুবই বিরল। বাংলাদেশী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সৌদি আরব থেকে পিএইচ ডি করেছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি আরবী, বাংলা এবং ইংরেজিতে সমান পারদর্শী ছিলেন, যা তাঁর লেখনী ও বক্তৃতায়, বিশেষতঃ মিশনারী অপতৎপরতা বিষয়ক দাওয়াতী কাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

১৯৯৮ সালে দেশে এসে তিনি প্রথমে 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে' কয়েক মাস শিক্ষকতা করেন। তারপর কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদীস এইসলামিক স্টাডিজ - বিভাগের 'লেকচারার' হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালে 'সহকারী অধ্যাপক', ২০০৪ সালে 'সহযোগী অধ্যাপক' ও ২০০৯ সালে তিনি 'অধ্যাপক' পদে পদোন্নতি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল ফিকহ বিভাগের খকালীন শিক্ষক- হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাবনা জেলার পাকশীতে অবস্থিত ফুরফুরা দরবারের 'জামিআতুল কুরআনিল কারীম' মাদরাসা ও ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত 'দারুস সালাম' মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারীর দরস দিতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাখাসসুস বিভাগদ্বয়েও নিয়মিত দরস দিতেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি একজন সফল শিক্ষক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যেসকল প্রতিষ্ঠানে তিনি পড়িয়েছেন সেখানকার ছাত্রঅনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্য -সহকর্মীদের আবেগ- দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও ২০০৩ সাল থেকে তিনি ঝিনাইদহ জেলার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ২০২০১১/০১/ খ্রিস্টাব্দে সমাজসেবা ও দ্বীনের বহুমুখী কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য 'আসসুন্নাহ ট্রাস্ট-' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তাঁর রেখে যাওয়া সকল দ্বীনী কাজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে সূচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি সরকারিবেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার আহ্বানে দ্বীনী দাও-য়াতের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব- আমিরাত, লিবিয়া ও তুরস্কসহ বিশ্বের অনেক দেশে সফর করেছেন। বহুবার তিনি হজ্ব পালন করেছেন।

ইন্তেকাল

বিগত ১১ মে ২০১৬ ঈরোজ বুধবার আনুমানিক সকাল আটটার দিকে এই . খ্যাতনামা আলেমেদ্বীন ঝিনাইদহ থেকে ঢাকা যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মাগুরা সদর উপজেলার পারনান্দুয়ালী এলাকার ঢাকা রোডের '৩নং ব্রিজ' নামক স্থানে বিপরীত দিক থেকে আসা 'রাইফ কার্গো সার্ভিস'- এর কাভার্ডভ্যানের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি ও তাঁর গাড়ির ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ ইন্তেকাল করেন ইন্না লিল্লা)হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউনমৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ।(আটান্ন বছর। বিভিন্ন কারণে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাঁর নামাযে জানাযা দেরি হয়ে যায়। পরদিন ১২ মে বাদ মাগরিব ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশাল মাঠে জানাযার নামাযের ঘোষণা দেয়া হয়। এদিন দুপুর থেকেই প্রচরোদ ছিলো। কিন্তু আসরের সময় আকাশ - মেঘলা হয়ে যায় এবং দু'এক ফোঁটা

বৃষ্টি ও মৃদুমন্দ বাতাস হাজারো মানুষের পদভারে ধূলিধূসরিত মাঠের পরিবেশকে শীতল ও ধূলামুক্ত করে দেয়। এরূপ মেঘলা শীতল পরিবেশে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ তাঁর জানাযার নামায আদায় করে। স্মরণকালের বৃহত্তম এই জানাযার মত আর কোনো জানাযা ঝিনাইদহবাসী দেখেনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আস-সুন্নাহ্ জামে মসজিদের নিকটে পিতার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রেখে যাওয়া সকল ভালো কাজ কবুল ও মাকবূল করুন এবং তাঁকে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন v

---

[1]   ১কথাগুলো তিনি অনেক ব্যাপকভাবে বলেছেন। বাস্তবতা তো সবার সামনে আছে। .

[2]   ২এ কথা মূলত আলিমে মুতাবাহহিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেখুন .,   উসূলুল ইফতা ও আদাবুহু, মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী।   - আবদুল মালেক

[3]   ৩. এ বিষয়টি একটু বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। ডআব .ুদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের কথা এবং কর্মপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি আরয করতে চাই যে,   শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহআমলের দিক . থেকে পূর্ণ হানাফী ছিলেন। অর্থাৎ নিজ এলাকার জুমহুর উলামাদের নিকট যে মতটি মুফতা বিহী এবং মামুল বিহী ছিল তিনি সেটার উপর আমল করতেন। হাঁ,   কোনো লেখক যদি বেখেয়ালিতে কোনো মাসআলা ভুল লিখে দিয়ে থাকেন বা জনসাধারণের মধ্যে যদি দলিলের বিপরীত কিছুর প্রচলন   ঘটে থাকে সেগুলোর উপর তিনি এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরামও আপত্তি করতেন। এবং সে অনুযায়ী বিলকুল আমল করতেন না। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহএর এই নীতির ভিত্তি-. সেই ‘‘সুন্নাহ ও উম্মাহর’’ মূলনীতি যার তাকীদ খোদ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব করতেন।

অবশ্য ইলমী তাহকীকের ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহএর মাসলাক এটা ছিল যে-.,   ইখতেলাফী মাসায়েলের মধ্যে তিনি দলিলের ভিত্তিতে যে কওলকে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে করতেন নিজের ইলমী লেখায় সেটাকে ‘রাজেহ’ লিখে দিতেন। এবং এর বিপরীতটাকে ‘মারজুহ’ লিখতেন। এবার চাই সেটা হানাফী ওলামাদের নিকট মুফতা বিহী ও মামুল বিহী হোক বা না হোক। এবং খোদ শাহ ছাহেবের আমল সেটার মোতাবেক হোক বা না হোক। এই তরযেই তিনি ‘মুসাফফা’ ‘মুসাওওয়া’ এবং ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’য় নিজের তাহকীকাত পেশ করেছেন।

ইলমী তাহকীক হয়ে থাকে উলামায়ে কেরামের চিন্তাভাবনার জন্যে। তাই কোনো মুতাবাহহির আলিম যদি নিজের ইলমী ও তাহকীকী কিতাবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই। বরং ভাল। কিন্তু যেহেতু তিনি যে মতকে মারজুহ বলছেন হাদীস ও সুন্নাহয় তারও দলিল বিদ্যমান আছে এবং আরো অনেক বা কিছু মুহাক্কিক আলিমের নিকট সেই দলিলটি অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য।   এ জন্য তিনি নিজের অথবা তার কোনো ভক্ত নিজের শায়খের তাহকীককে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখেন না। তাই শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহকখনো এমন . করেননি। এবং তার শাগরিদ ও খলীফারাও কখনো

এমন করেননি। এটিই সেই জায়গা যেখানে মানসুস আলাইহি ও মুজমা আলাইহি মাসআলা থেকে মুজাতাহাদ ফীহ ও মুখতালাফ ফীহ মাসআলা পার্থক্য হয়ে যায়।

আজ যদি কেউ ইনসাফের সাথে সে সকল মাসআলার মুতালাআ শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহএর কিতাব -. থেকে করার পাশাপাশি তার রূহানী সন্তান আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহএর কিতাব থেকেও করেন -. তাহলে দেখতে পাবেন ঐ মাসআলাগুলো দলিলের দিক থেকে কত মজবুত, যাকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহমারজুহ . বলেছেন। ইল্লা মাশাআল্লাহ যদি দুয়েক মাসআলার দলিল বাস্তবেই মারজুহ হয় তাহলে সেটা ব্যতিক্রম। এজন্যই শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহএর উপর পূর্ণ এ-.'তেকাদ থাকা সত্ত্বেও আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বান্নুরী রাহমাআরিফুস সুনানে . 'খুতবা চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে কি না' এই মাসআলায় লিখেছেন,

و لولي الله الدهلوي مع جلالة قدره في كتابه آراء يشكل أن يوافق عليها.

অর্থাৎ শাহ ওয়ালি উল্লাহ রাহবড় .   ব্যক্তিত্ব   হওয়া সত্ত্বেও তার কিতাবাদিতে   কিছু কথা এমন আছে যার সাথে একমত হওয়া কঠিন।   - মাআরিফুস সুনান খপৃ ৪ .. ৩৬৭

শাহ ছাহেবের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এখানে যা কিছু লেখা হল মূলত সেটি শাহ ছাহেবের একটি দস্তখত থেকে বুঝা যায়। পাটনার খোদাবখশ লাইব্রেরীতে সহীহ বুখারীর সেই নোসখা বিদ্যমান রয়েছে যাতে মুহাম্মদ বিন পীর মুহাম্মদ শাহ ছাহেবের নিকট বুখারী শরীফ পড়েছেন। সেখানে শাহ ছাহেব ইজাযতের দস্তখতে নিজের নামের সাথে লিখেছেন,

" طريقة، الحنفي عملا و الحنفي الشافعي تدريسا، خادم العمري نسبا، الدهلوي وطنا، الأشعري عقيدة، الصوفي
والفقه والحديث و التفسير العربية والـ. . . .   ২৩॥شوال১১৫৯هـ

তাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে শাহ ছাহেব আমলের দিক থেকে হানাফী ছিলেন। তাদরীস ও) শাফেয়ীও ছিলেন হানাফীও ছিলেন। শাহ (তাসনীফে ছাহেবের এই দস্তখতের আলোচনা বান্দা হযরত নোমানী ছাহেব রাহ .থেকে একাধিকবার শুনেছে। এবং হযরত পালনপুরী ছাহেবও সেটি 'রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআ'য় নকল করেছেন।   (খপৃ ১ .. ৫১(৫২-

[4] ৪নিয়ত ও পদ্ধতি যদি কারো মন্দ হয় তার আমলটাকে কীভাবে নির্দ্বিধায় মন্দত্ব মুক্ত বলে দেওয়া . যায়, সে   যে মত বা মাযহাবের হোক। - আবদুল মালেক

[5] ৫ঢালাওভাবে এই ঘরাণার সবার জন্য এই সনদ কীভাবে দেওয়া যেতে পারে। মানহাজ আপত্তিকর . হলে চেতনা কীভাবে ভাল হয়? আর তাদের কারো কারো আকীদার ভ্রান্তি তো তাদের ছাপানো বইপত্রে এসে গেছে। - আবদুল মালেক